কেবল অর্থনৈতিক সংস্কার নয়, সংকট সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সংস্কার

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক; ১ নভেম্বর ২০২২

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাধিক বক্তব্যে আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় সকলকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বভাবতই এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে; পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত দিচ্ছেন। অর্থনৈতিক নানা সূচকও একটি মন্দা পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমতির দিকে–মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে দশ বিলিয়ন ডলারের মতো মজুদ (রিজার্ভ) হ্রাস পেয়েছে। সরকারি হিসেব মতে, মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের বেশি। টাকার সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। দেশের চলতি হিসাব তথা কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্সে (১৯ বিলিয়ন ডলার, সমকাল-জুলাই) সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক ঘাটতি।

এমন পরিস্থিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে ৪৫০ কোটি ডলার (৪.৫০ বিলিয়ন) ঋণ সহায়তা চেয়ে আবেদন করে বাংলাদেশ সরকার। গত ২৬ অক্টোবর আইএমএফের একটি প্রতিনিধি দল ঋণ সহায়তার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার অংশ হিসেবে ১৫ দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করছেন। ঋণের শর্ত হিসেবে আইএমএফ দেশের আর্থিক নীতিতে কিছু সংস্কার আনার অনুরোধ জানিয়েছে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। আইএমএফের শর্তের মধ্যে রয়েছে: রিজার্ভের যথার্থ হিসাব তৈরি করা ও রিজার্ভের টাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহার না করা, ব্যাংকিং খাতে সংস্কার, ঋণের টাকায় ভর্তুকি না দেওয়া (উল্লেখ্য, সুজন জনগণের দুর্ভোগ কমাতে ভর্তুকির পক্ষে, কিন্তু ক্যাপাসিটি চার্জের ন্যায় ভর্তুকিগুলোর বিরুদ্ধে), বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে জ্বালানির দাম নির্ধারণ করা ইত্যাদি।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে আইএমএফ সাধারণত এই ধরনের আর্থিক খাতের সংস্কার প্রস্তাব দিয়ে থাকে। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানকেও আইএমএফ কাছাকাছি ধরনের শর্ত দিয়েছিল। শ্রীলঙ্কাকে দেওয়া ২৯০ কোটি ডলার সহায়তার শর্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি শক্তিশালী করা, তথ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি চালু করা, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ শক্তিশালী করা ইত্যাদি। পাকিস্তানকে ১১০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তার ক্ষেত্রেও কাছাকাছি শর্তই দেওয়া হয়। তবে পাকিস্তানে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান জোরদার করা ও সম্পদের হিসাব প্রদানের শর্তও যুক্ত করা হয়।

এটি সুস্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক সংস্কারের বিষয়ে আইএমএফ এবং সরকার কতগুলো বিষয়ে ঐকমত্য হবে। তবে আইএমএফ প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সংস্কারগুলো জরুরি হলেও তা সংকট সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয় বলে আমরা মনে করি। কেননা আমাদের বর্তমান সংকটটি শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয়, এর সঙ্গে আরও দুটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি হলো কার্যকর গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি তথা 'ডেমোক্রেটিক ডেফিসিট'। অপরটি সুশাসনের অভাব বা 'গভার্নেন্স ফেইলিউর'। এই তিনটি সংকটের মধ্যে গভীর যোগসূত্র আছে, বস্তুত এগুলো একইসূত্রে গাঁথা।

প্রথমত, গণতন্ত্রের প্রধানতম অনুষঙ্গ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। কিন্তু ২০১৪ ও ২০১৮ সালের দুটি একতরফা ও ব্যর্থ জাতীয় নির্বাচনের কারণে সরকার আর জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। যেহেতু প্রতি পাঁচবছর অন্তর অন্তর ক্ষমতাসীনদের আর জনগণের কাছে 'ভোট ভিক্ষার' জন্য যাওয়ার প্রথা ভেঙে গিয়েছে – অর্থাৎ 'নির্বাচিত' হওয়ার জন্য ক্ষমতাসীনদের আর জনগণের ভোটের প্রয়োজন হয় না – তাই সরকারের আর জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে কাজ করার দায়বদ্ধতা নেই। যারা তাদেরকে ক্ষমতায় এনেছেন ও ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছেন এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে যাদের ওপর নির্ভর করতে হবে, সরকারকে সেই প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকেই সন্তুষ্ট রাখতে হয়। অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'নিম্নমুখী' দায়বদ্ধতার অতি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো আমাদের দেশে ভেঙে পড়েছে। বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের লেজিটিমেসির সমস্যা মোকাবিলার জন্য সরকারকে বলপ্রয়োগ ও নানা কালাকানুনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার হরণ করতে হয়। বাংলাদেশে ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে প্রবর্তিত ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এবং পরবর্তীতে নতুন নতুন আইন-কানুন করে মানুষের মতপ্রকাশের অধিকারকে আইনি প্রক্রিয়ায় হরণ করা হয়েছে। এগুলোই ডেমোক্রেটিক ডেফিসিটের অন্যতম কারণ।

অর্থনৈতিক সংকটের আজকের এই ভয়াবহতার জন্য দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে তা হলো গভার্নেন্স ফেইলিওর বা সুশাসনের অভাব। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানবাধিকার ও আইনের শাসনের অভাব থেকে শুরু করে ন্যায়পরায়ণতার অনপুস্থিতি, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের অভাব। সরকারের আশীর্বাদপুষ্টরা যে যেখানে পারছে গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েম করে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় লুটপাটের আয়োজন এবং বিদেশে অর্থ ও সম্পদ পাচারের ঘটনার স্বরূপ উন্মোচিত হলেও তারা বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। একইসঙ্গে পাতানো বিরোধী দল সৃষ্টি ও বিচার

বিভাগের দলীয়করণের কারণে 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স' পদ্ধতি তথা আমাদের সমান্তরাল দায়বদ্ধতার কাঠামোও বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের আমলাতন্ত্র এখন 'জনগণের সেবক' অপেক্ষা 'জনগণের প্রভূ'; যা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরেকটি বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। এর ফলশ্রুতিতে অপ্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং লুটকৃত টাকা বিদেশে পাচারসহ নানা অনিয়মের ফলেই দেশে এ অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে -- যা কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আরও প্রকটরূপ ধারণ করেছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ না হলেও বর্তমান জ্বালানি সংকট অবশম্ভাবীই ছিল। এটাকে খোলাচোখে অর্থনৈতিক সংকট মনে করা হলেও আদতে এর শেকড় অনেক গভীরে।

এমতাবস্থায় আইএমএফ প্রদত্ত ঋণ 'ফুটো কলসি সিনড্রম' বা ছিদ্রযুক্ত কলসিতে পানি ঢালার মতোই হতে পারে। অর্থাৎ ফুটো কলসিতে পানি যতই ঢালা হোক তাতে যেমন কলসি ভরবে না, তেমনি রাজনৈতিক তথা গণতন্ত্রের ঘাটতি পূরণ অর্থাৎ জনগণের ভোটাধিকার ফেরত প্রদান এবং দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের লাগাম টানা সম্ভব না হলে অর্থনৈতিক সংকট থেকেই যাবে। কেননা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট সমাধান পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি সম্ভব নয়।

আমরা মনে করি, দেশের চলমান অর্থনৈতিক সংকট সমাধান করতে হলে কিছু কার্যকর রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রথম ও আবশ্যকীয় পদক্ষেপ হবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান। তবে শুধু নির্বাচিত সরকারই গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ব্যক্তি ও কোটারি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনস্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না করা, ব্যক্তিতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্র পরিহার করা। পরিচ্ছন্ন ও জনমুখী শাসন কাঠামো গড়ে তোলা। বাক-স্বাধীনতাসহ নাগরিকদের সব অধিকার সমুন্নত রাখা। পাশাপাশি সব রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার চর্চা করা, যথাযথ আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও তা পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সব কাজে সবার অন্তর্ভুক্তিকরণ, সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করা। সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

আমরা মনে করি উপরোল্লিখিত সমস্যাসমূহ কোনো দলের পক্ষে এককভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়। এগুলোর কার্যকর ও টেকসই সমাধানের জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আর এ প্রচেষ্টার ভিত্তি হতে পারে সুদূর প্রসারী কিছু সংস্কার প্রস্তাব; যার ভিত্তিতে প্রণীত হতে পারে একটি 'জাতীয় সমঝোতা-স্মারক' বা 'জাতীয় সনদ'; যা স্বাক্ষরিত হতে পারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দ্বারা -- যেমন করে ১৯৯১ সালের 'তিনজোটের রূপরেখা' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সুজন দীর্ঘদিন থেকে 'জাতীয় সনদ'-এর ধারণাটি নিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছে। জাতীয় সনদ বা সমঝোতা স্মারকে ঐকমত্যের ক্ষেত্র হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হতে পারে:

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিহিংসাপরায়ণতার অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও শিষ্টাচারবোধ ফিরিয়ে আনা এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক রাজনীতির চর্চা করা। রাজপথে হানাহানির পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সকল জাতীয় সমস্যার সমাধান করা। ব্যক্তি ও কোটারি স্বার্থের পরিবর্তে জনস্বার্থকে রাজনীতির লক্ষ্যে পরিণত করা।

২। নির্বাচনী সংস্কার: অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু ও গ্রহযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে আইনকানুন এবং বিধিবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং এগুলির কঠোর প্রয়োগ করা। নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইনের যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে সৎ, নিরপেক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের নিয়ে স্বচ্ছভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন করা।

৩। নির্বাচনকালীন সরকার: সরকার তথা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষ আচরণ ছাড়া সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব। তাই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অথবা সমাজের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য একটি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা।

৪। কার্যকর জাতীয় সংসদ: জাতীয় সংসদকে একটি স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, যাতে নির্বাহী বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে 'চেকস এ্যান্ড ব্যালেন্সেস' পদ্ধতি কার্যকর হয়। স্থানীয় উন্নয়নে জড়িত হওয়ার পরিবর্তে – যা *আনোয়ার*

হেসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ [১৬ বিএলটি (এইসসিডি) ২০০৮] মামলার রায় অনুযায়ী সংবিধানের লঙ্ঘন – সংসদ সদস্যগণ আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে ভুমিকা রাখেন। সংসদ সদস্যদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন এবং সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ-অধিকার ও দায়মুক্তি আইন' প্রণয়ন করা।

৫। স্বাধীন বিচার বিভাগঃ প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ণ করা; যাতে আইনানুযায়ী সঠিক ব্যক্তিদেরকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা সম্ভব হয়।

৬। সাংবিধানিক সংস্কারঃ সাংবিধানিক সংস্কারের লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন, যাদের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধন করা। সংবিধান সংশোধনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমুহ হতে পারে: রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা, সংসদের এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা, সংসদে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার, গণভোটের বিধানের পুনঃপ্রবর্তন ইত্যাদি।

৭। গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক দলঃ গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ; সকল রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান সংযোজন ও তা অনুসরণ এবং *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর* বিধান অনুযায়ী দলের লেজুড়বৃত্তির অঙ্গ, সহযোগী সংগঠন ও বিদেশী শাখা বিলুপ্ত করা, যাতে ফায়দা প্রদানের ও স্বার্থ হাসিলের রাজনীতির অবসান হয়। সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, পরিচয়ভিত্তিক বিদ্বেষ ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার পরিহারের ঘোষণা প্রদান করা।

৮। স্বাধীন বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানঃ স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের মত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা এবং এসকল প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা; যাতে আইনানুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়।

৯। দুর্নীতি বিরোধী সর্বাত্মক অভিযানঃ একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠনের মাধ্যমে (মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত ট্রাইবুন্যালের মত) দুর্নীতিবাজদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টন্তমূলক শাস্তি প্রদান করা এবং তাদের অবৈধভাবে উপার্জিত এবং পাচারকৃত অর্থ বিদেশ থেকে ফেরত আনা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ করা।

১০। প্রশাসনিক সংস্কারঃ যথাযথ প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী *জনপ্রশাসন আইন* প্রণয়ন এবং মান্ধাতার আমলের *পুলিশ আইনের* সংস্কার করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা। ঔপনিবেশিক শাসনকালে সৃষ্ট আমাদের ওপর জেঁকে বসা 'প্রভুত্বের' কাঠামোর অবসান করা। প্রশাসন, বিশেষত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে দুর্নীতির অবসান করা এবং সরকারি কর্ম কমিশনকে একটি নিরপেক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১১। বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকারঃ আইনকানুন ও বিধিবিধানের যথাযথ পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা, যাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বায়ত্তশাসিত, নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও কার্যকর হতে পারে। স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫০ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নামে বরাদ্দ করা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহের (এসডিজি) স্থানীয়করণ করা।

১২। গণমাধ্যমের স্বাধীনতাঃ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ আইনি সংস্কার, বিশেষত *ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন, ২০১৮*-এর নিবর্তনমূলক ধারাসমূহ বাতিল করা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রচার কমিশন গঠন করা।

১৩। শক্তিশালী নাগরিক সমাজঃ একটি কার্যকর ও শক্তিশালী নাগরিক সমাজ গঠনের পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা, যাতে রাষ্ট্রবহির্ভূত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি সকল সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে কার্যকর করাসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে পারে। অযাচিত নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানোর মাধ্যমে নাগরিক সমাজের কাজের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১৪। মানবাধিকার সংরক্ষণঃ মানবাধিকার সংরক্ষণ ও নাগরিকের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার লক্ষ্যে নিবর্তনমূলক আইনসমূহের সংস্কার এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাতিল করা এবং জনস্বার্থবিরোধী নতুন আইন প্রণয়ন থেকে বিরত থাকা। গুম, অপহরণ ও বিচারবহির্ভূত

হত্যার অবসানের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংস্কৃতির অবসান করা। প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান করা।

১৫। একটি নতুন সামাজিক চুক্তি: রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান আয় ও সুযোগের বৈষম্য নিরসনে একটি নতুন সামাজিক চুক্তি প্রণয়ন করা, যাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর নায্য হিস্যা নিশ্চিত হয়। একইসাথে তারা যেন মানসম্মত সেবা সুলভমূল্যে ও দায়বদ্ধতার সাথে পেতে পারেন এবং সত্যিকারর্থেই রাষ্ট্রের মালিকে পরিণত হন।

১৬। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা: জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের পুনর্মূল্যায়ন করে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রকল্পসমূহ বাতিল করা।

১৭। আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা: আর্থিক খাতে লুটপাট প্রতিরোধসহ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার ও তা বাস্তবায়ন করা। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি ও সকল ধরনের লুণ্ঠনকারীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা।

১৮। সাম্প্রদায়িক মানসিকতার অবসান: সমাজের সকল শুভ শক্তিকে সংগঠিত করে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতা নিরসনে একটি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।

১৯। তরুণদের জন্য বিনিয়োগ: 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বা জনসংখ্যাজনিত বিশেষ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে তরুণদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থসেবা, নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। গ্রামীণ শিক্ষার মনোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২০। নারীর ক্ষমতায়ন: নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি সকল নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সকল ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সমসুযোগের ব্যবস্থা করা।

২১। পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন: পাহাড়ী আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে পার্বত্য শান্তি চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন করা। একইসাথে সমতলের আদিবাসীসহ দলিত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাঁদের অগ্রগতির পথ সুগম করা।

আমরা মনে করি যে, বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানে পৌঁছার লক্ষ্যে উপরিউক্ত সংস্কার ধারণাগুলোকে আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করে সকল স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মধ্যে একটি সংলাপের আয়োজন এবং তা থেকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একটি ঐক্যমত্য সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবি। এমন ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই তৈরি হতে পারে একটি জাতীয় সনদ, যাতে সকল স্বার্থসংশ্লিষ্টরা স্বাক্ষর করবেন এবং জরুরি ভিত্তিতে এটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। স্বাক্ষরিত জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে স্বল্প মেয়াদের একটি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন, যার দায়িত্ব হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আয়োজন। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন, তাদেরই দায়িত্ব হবে সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট জাতীয় সনদের পরিপূর্ণ ও যথাযথ বাস্তবায়ন। তাহলেই আমাদের জটিল ও ভয়াবহ সমস্যাসমূহের একটি কার্যকর সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে। তাই জাতিকে জঞ্জাল মুক্ত করতে আমাদের রাজনীতিবিদদেরকেই এখন সাহসিকতা, প্রজ্ঞা ও নিঃস্বার্থতা প্রদর্শন করে এগিয়ে আসতে হবে।